বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ রাশিয়ার ভূমিকা (১৯৭১-৮১)

আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন*

সার সংক্ষেপ ঃ বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের এক দশক (১৯৭১-৮১) রাশিয়া 'আদর্শ নয় বরং জাতীয় স্বার্থের' দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়েছে। উপমহাদেশের তিনটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা ভারত মহাসাগরে তার প্রভাব বলয় নিশ্চিত করাই ছিল রুশ নীতির প্রধান লক্ষ্য। বর্তমান প্রবন্ধে তিনটি দিক আলোচনায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকা, দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমলে দুদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে রুশ নীতি আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, দুদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে (১৯৭৫-৮১) সাল পর্যন্ত রাশিয়ার ভূমিকা মূল্যায়ন করা হবে। তত্ত্ব-কাঠামো অংশে যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে দুটি তত্ত্ব- ক. আদর্শ ও খ. জাতীয় স্বার্থ আলোচনা করে দেখানো হয়েছে আদর্শ কোনভাবেই উপর্যুক্ত সময়ে রুশ নীতিতে প্রাধান্য পায়নি বরং জাতীয় স্বার্থই বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধ রুশ বিবেচনায় প্রাধান্য পেয়েছে কম। রাশিয়া মুক্তিযুদ্ধকে কখনো খোলাখুলি সমর্থন করেনি বা খোলাখুলিভাবে পাকিস্তানের বিরোধিতাও করেনি। ১৯৭১ সালে আগস্ট মাসে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির পরও ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের আগে পর্যন্ত রুশ নীতি পাকিস্তান কাঠামোতে আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। বরং রুশ নীতিতে ভারত কেন্দ্রিক প্রবণতা বেশি কার্যকর ছিল।

ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মিত্রতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে স্থায়ী মিত্র হিসেবে ধরে নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় রাশিয়া আগ্রহী হয়। উপমহাদেশের তিনটি দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রাশিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী তৎকালীন দুই পরাশক্তি চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত মহাসাগর ও উপমহাদেশ থেকে দূরে রাখার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। নিজস্ব স্বার্থের বিবেচনায় রাশিয়া তাই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত ইস্যুতে যে টানাপোড়েন চলছিল তা মীমাংসায় ভূমিকা রাখার চেষ্টা চালায়। যদিও এ ব্যাপারে পাকিস্তানের কট্টর মার্কিন ও চীন ঘেঁষা নীতির কারণে রুশ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা, আগস্ট মাসে দিল্লি চুক্তি, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের পেছনে রুশ প্রভাব ছিল প্রবল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রভাব বলয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাশিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই তৎপর ছিল। যদিও সীমিত আর্থিক সহায়তার কারণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে রুশ প্রভাব স্থায়ী হয়নি। এছাড়া ১৯৭৪ সালের পর পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভুট্টো সরকারের রাশিয়ার মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা কমে আসতে থাকে। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে মুজিবের মৃত্যুর পর

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে দুটি দেশের ব্যাপারে রুশ ভূমিকা তেমন লক্ষনীয় ছিল না। বরং মুজিবের উত্তরসুরিদের সরাসরি রুশ বিরোধী নীতি, আফগান ইস্যুতে পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের চরম অবনতি এবং এতে বাংলাদেশের পাকিস্তানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন রুশ সরকারকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ব্যাপারে অনাগ্রহী করে তোলে। এ সময় অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ে যেখানে রুশ নীতি জড়িত ছিল সেখানে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে একযোগে রাশিয়ার বিরোধিতা করে। ১৯৭৫-৮১ সাল পর্যন্ত এই নীতিতে উভয় দেশ অটুট থাকে।

বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ রাশিয়ার ভূমিকা (১৯৭১-৮১)

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় থেকে উপমহাদেশের দুটি দেশ- পাকিস্তান ও ভারতের প্রতি রাশিয়া ভূ-রাজনৈতিক কারণে দৃষ্টি দেয়। তবে আদর্শিক বিবেচনায় ধর্মাশ্রয়ী পাকিস্তানের চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রতিই রুশ আগ্রহ বেশি ছিল এবং এ কারণে তুলনামূলকভাবে রাশিয়া ভারতকেন্দ্রিক নীতি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় রুশ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ঐক্যের ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও তার দীর্ঘদিনের মিত্র ভারতের চাপে এবং বিশ্ব রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়া ক্রমান্বয়ে ভারতকেন্দ্রিক অবস্থান গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভারতের মিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতি রুশ নেতৃবৃন্দের প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে রাশিয়া বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয় দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতি ছিল। যে কারণে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নেপথ্যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে এনে দুটি দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্য রাশিয়া কাজ করে যায়। যদিও শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের শাসকদের রুশ-ভারত প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে ক্রমান্বয়ে চীন-মার্কিন বলয়ে অবস্থান বাংলাদেশে রুশ প্রভাব ক্ষুন্ন করে। পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের বিভিন্নতা দেখা যায়। তবে ১৯৭১-৮১ সাল পর্যন্ত কোন সময়ই রাশিয়া বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান নেয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে তিনটি দিক আলোচনায় আনা হয়েছে। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকা, দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ রাশিয়ার ভূমিকা (১৯৭১-৭৫) এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ রাশিয়ার ভূমিকা (১৯৭৫-৮১)।

১. মুক্তিযুদ্ধ ও রাশিয়া

মুক্তিযুদ্ধে রুশ নীতি ছিল সতর্কমূলক, ভারতকেন্দ্রিক এবং চূড়ান্তভাবে চীন-মার্কিন বিরোধী জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার নীতি তিন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্ব মার্চ-জুলাই মার্স পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্ব আগস্ট-নভেম্বর মাস এবং তৃতীয় পর্ব নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এবং প্রতি পর্বেই সোভিয়েত নীতি ছিল সতর্কতামূলক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ৪ দিন পর ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ

কমিউনিস্ট পার্টির ৩৪ তম পার্টি কংগ্রেসে ব্রেজনেভ তাঁর দেশের এশীয় নীতির ব্যাখ্যা করে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বাংলাদেশ পরিস্থিতি এড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানান।[১] ইতোমধ্যে ভারত মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরও ব্রেজনেভের বক্তৃতায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ না করার পেছনে হয়তো এমন কারণ থাকতে পারে যে, দেশটির পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা অবগত হলেও তখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছা রুশ নেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও বাংলাদেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হলে ২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে এক পত্রে 'পূর্ব পাকিস্তানে' নির্যাতন বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানান। এই পত্রে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দের ব্যবহার এবং অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও শেখ মুজিব ও অন্যান্য রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার ও বাংলাদেশে গণহত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।[২] যদিও এ পত্রটি পাকিস্তানকে খুশি করতে পারেনি এবং পত্রের ভাষা ভারতপন্থী বলে অভিহিত করে পাকিস্তান তা প্রত্যাখান করে। অবশ্য এই পত্র ছাড়া সে সময় রাশিয়া বাংলাদেশ সংকটে তেমন উৎসাহ দেখায়নি। রাশিয়া এসময়ে কয়েকটি কারণে বাংলাদেশ সংকটে সরাসরি জড়াতে চায়নি। প্রথমত, রাশিয়া দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির ব্যাপারে সেই মুহূর্তে আগ্রহী ছিল না (১৯৪৭ সালের রাশিয়া ভারত বিভক্তিরও বিরোধী ছিল)। দ্বিতীয়, ১৯৬০ সালের পর পাকিস্তানের সঙ্গে গড়ে ওঠা তার সতর্কতামূলক সম্পর্কেও চিড় ধরাতে চায়নি। তৃতীয়, রাশিয়া এই সংকটে জড়িয়ে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে চায়নি। চতুর্থত, রাশিয়া বাংলাদেশ সরকারের কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টপন্থিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের এই ধারণাকে সংহত করে।[৩] রুশ এই মনোভাব প্রবাসী বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল। মে মাসে তাই উভয় সরকার এ ব্যাপারে রাশিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে এবং বাংলাদেশ সরকার আবদুস সামাদ আজাদকে প্রতিনিধি হিসেবে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে পাঠায়। যদিও তিনি মস্কো সরকার বা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হন।[৪] এ মাসেই বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রাশিয়াসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর প্রতি মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের আহ্বান জানায়। ৮ জুন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং মস্কো সফর করেন এবং বাংলাদেশ ইস্যুতে ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ যাতে খোলাখুলি বক্তব্য দেন তার জন্য চেষ্টা চালান। এ-ব্যাপারে যদিও তিনি সফল হতে পারেননি। রুশ নেতারা শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তান সমস্যার সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেন। তবে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মস্কো সফর শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে উভয় দেশ শরণার্থী গমন বন্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি নিশ্চিত ও তাদের নিরাপদে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপার ঐকমত্যে পৌছান।[৫] ৯ জুন প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন সুপ্রিম সোভিয়েতের

নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রদত্ত এক ভাষণে বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে উদ্বেগ প্রকাশ করে পাকিস্তান সরকারের কাছে শরণার্থীদের গৃহে প্রত্যাবর্তনে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।[৬] এ পর্যায়ে রুশ বক্তব্য শরণার্থী-কেন্দ্রিক হলেও আগের চেয়ে দেশটির নীতি অনেকটা ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি হতে শুরু করে।

পরের মাসে অবশ্য বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের রুশ নীতি আরো ভারতের কাছাকাছি চলে আসে। ৯-১১ জুলাই মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. হেনরি কিসিঞ্জারের ভারত সফর, গোপনে পাকিস্তানে থেকে চীন সফর এবং ভারতকে হুমকি প্রদানের পর স্পষ্ট হয়ে ওঠে মার্কিন-চীন ও পাকিস্তান আঁতাতে ভারত একা এবং নিরপত্তাহীন। কাজেই ভারত ও রাশিয়ার পারস্পরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকি দেখা দেয় এবং এই প্রেক্ষাপটে ৯ আগস্ট দিল্লিতে স্বাক্ষরিত হয় রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি। এই চুক্তির নবম ধারায় এর প্রকৃত গুরুত্ব নিহিত ছিল। এতে বলা হয়, "উভয় দেশের কারো বিরুদ্ধে যদি বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে এই বিপদ অপসারণের জন্য উভয় দেশ অবিলম্বে আলোচনায় বসে এবং তারা শান্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"[৭] অবশ্য এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে কোনো ধারা ছিল না। তবে এই চুক্তির পরের দিন ঐকমত্যে উপনীত হয়। ফলে আগস্ট মাসের পর রুশ নীতিতে বাংলাদেশ বিষয়ে আরো সম্পৃক্ততা আসে। এই চুক্তির পর এটি নিশ্চিত হয়ে পড়ে একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। হয়তো এ কারণেই কিসিঞ্জার এই চুক্তিকে একটি Bombshell হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৮] চুক্তি স্বাক্ষর ও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর দিল্লি সফর শেষে ১১ আগস্ট প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে উভয় পক্ষ মৈত্রী চুক্তির তাৎপর্য এবং পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে বলা হয় ঃ

> Their firm conviction that there can be no military solution and considered it necessary that urgent steps be taken in East Pakistan for the achievement of a political solution and for the creation of conditions of safety for return of the refugees to their homes which alone would answer the interests of the entire people of Pakistan and the cause of the preservation of peace in the area.[৯]

চুক্তির পর রুশ নীতির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে রুশ সরকার আগস্ট মাসেই পূর্ববঙ্গের সমস্যা সমাধানে জেনারেল ইয়াহিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১০] এই চিঠি প্রাপ্তির পর পরই পাকিস্তান পররাষ্ট্র সচিব সুলতান মোহাম্মদ খানকে মস্কো পাঠায়। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এই সফরকালে তিনি পাকিস্তানের নীতির ব্যাখ্যা করেন এবং দেশে ফিরে মন্তব্য করেন যে, রুশ নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেছেন পাকিস্তানের সমস্যা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।[১১] যদিও অন্য কোন উৎস এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতের নীতির ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন হয়েছে সে তুলনায় রুশ নীতির পরিবর্তন

খুব সামান্যই হয়েছে। এই চুক্তি সম্পাদনের এক সপ্তাহ পরেই রাশিয়ার পক্ষ থেকে পাকিস্তানের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য অব্যাহত রাখার ঘোষণা[১২] থেকে মনে হয় রুশ নীতি তাদের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা থেকেই পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে বাংলাদেশের সমর্থনে কোনো রকম প্রতিশ্রুতি আদায়ে সক্ষম হয়নি। তবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে রাশিয়া ও ভারতের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সফর বেড়ে যায়। ইন্দো-রুশ সাংস্কৃতিক মিশন, রুশ প্রতিনিধি এস.কে. জারাপকিন (Tsarapkin) এবং উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিন দিল্লী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ডি.পি.ধর মস্কো সফর করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফর শেষে ২৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে রাশিয়া মুক্তিযুদ্ধকে 'জাতীয় মুক্ত সংগ্রাম' বলে অভিহিত করে এবং ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সহায়তা দিতে সম্মত হয়।[১৩] ইন্দিরার সফরের প্রতিক্রিয়া হিসেবে রুশ নেতারা পাকিস্তানের সামরিক নেতাদের প্রতি মুজিবের মুক্তির দাবি জানান এবং পূর্ববঙ্গ সমস্যার সমাধানে মুজিবের সঙ্গে আলোচনাকে প্রাধান্য দেন।[১৪] এর পরপর রাশিয়ার পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন সংগঠন একই দাবি করতে থাকে।[১৫] ১ অক্টোবর হ্যানয় যাওয়ার পথে একদিনের জন্য দিল্লী যাত্রা বিরতি করেন রুশ প্রেসিডেন্ট এন.ভি. পদগোর্নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মস্কো সফরের একদিন পর এই সফর বাংলাদেশ প্রশ্নে রুশ নীতির আরো সম্পৃক্ততারই সাক্ষ্য দেয়। ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি.ভি. গিরির দেয়া ভোজসভায় রুশ প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে একটি মীমাংসায় পৌছানোর লক্ষ্যে অভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এর থেকে রুশ মনোভাবকে ভারতের মনোভাবের খুব কাছাকাছি বলে ধরে নেয়া যায়। ১২ অক্টোবর ইরানের রাজতন্ত্রের ২৫০০ তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে তেহরানে যোগদানকারী ভারত ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্টের ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। রুশ সূত্র থেকে দাবি করা হয় যে, পদগোর্নি-ইয়াহিয়া বৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, মুজিবের মুক্তি ও শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির পরামর্শ দেন।[১৬] কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে গেলে এ বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়নি। ফলে রাশিয়া ও ভারত দ্বিপাক্ষিকভাবে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে তাদের ভাবনা অব্যাহত রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ২২ অক্টোবর রুশ উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরুবিন ৪ দিনের জন্য দিল্লি যান। সফরকালে তিনি জাতিসংঘের মাধ্যমে মার্কিন পরিকল্পনা মোতাবেক পর্যবেক্ষক নিয়োগের ধারণাকে প্রত্যাখান করেন। তাঁর মতে শেখ মুজিবের মুক্তি ও পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার দ্রুত নিস্পত্তি ছাড়া শুধু ভারত সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে যুদ্ধের আশংকা রোধ সম্ভব নয়। পাশাপাশি তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ২৪

অক্টোবর নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেন।[১৭] তাঁর সফরের দুদিন পর প্রকাশিত রুশ-ভারত যুক্ত ইশতেহারে বলা হয় বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক শান্তি বিপন্ন হয়ে পড়ায় ভারত- সোভিয়েত চুক্তির নবম ধারা মতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং রাশিয়া ভারতের সঙ্গে একমত হয়েছে যে, পাকিস্তান খুব শিগগিরই যুদ্ধ শুরু করতে পারে।[১৮] এই আশঙ্কা রুশ নীতিকে ভারতের কাছাকাছি নিয়ে আসে। পরের দিনই লোকসভায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধলে ভারত রাশিয়ার পূর্ণ সহযোগিতা পাবে।[১৯]

এই যুক্ত ঘোষণার ৩ দিন পর অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর রুশ বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল কুতাকভের (P.S. Koutakhov) নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সামরিক প্রতিনিধি দলের দিল্লী উপস্থিতি এবং মার্কিন দাবি মোতাবেক ১ নভেম্বর থেকে আকাশ পথে ভারতের জন্য রুশ অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারটি সম্ভাব্য যুদ্ধকে নিশ্চিত করে।[২০] অবশ্য নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ভুট্টোর চীন সফরকালে রুশ পার্লামেন্টারি কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রতিনিধিরা দিল্লি সফর করেন এবং এ দলের নেতা ভি. কুডরেভটেসেভের (kudryavtsev) ৯ নভেম্বর দিল্লিতে প্রদত্ত বক্তৃতা ভারতকে হতাশ করে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ “As a liberation movement with an element of civil war in it”[২১] বলে আখ্যায়িত করেন। এর থেকে মনে হয়, ইন্দিরা গান্ধীর ব্যর্থ মার্কিন সফর ও ভুট্টোর চীন সফরের ফলাফলের প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছুটা পিছু হটে গিয়েছে এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে একটি সমঝোতার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। ৩০ নভেম্বর ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত নিকোলাই পেগভ (Pegov) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পক্ষ থেকে কোসিগিনকে দেয়া পত্রে জাতিসংঘে উপমহাদেশের উদ্ভুত সমস্যা উত্থাপন বিষয়টি অবহিত করেন। এর থেকে পরিস্কার হয়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ যাতে না বাঁধে সে দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সচেষ্ট।[২২]

তবে ৩ ডিসেম্বর চুড়ান্ত যুদ্ধ বা পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে রাশিয়ার পক্ষে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির কারণে এর থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। ভারতের সঙ্গে রাশিয়াও একমত হয় যে, শেখ মুজিবের মুক্তি এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরই পূর্ববঙ্গ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় এবং যুদ্ধে ভারতের বিজয়ের মাধ্যমে তা অর্জন সম্ভব। আর এ কারণে জাতিসংঘের যে কোন ধরনের যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে। ৪ ও ৭ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত মার্কিন প্রস্তাব রুশ ভেটোর ফলে প্রত্যাখ্যান হলে ৭ ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদের তা পাঠানো হয়। রাশিয়া তৃতীয় বারের মতো ১৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে ভেটো দেয়। এক্ষেত্রে রুশ নীতি ছিল ভারতীয় বাহিনী ঢাকা দখল করার আগে পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতির অনুকুলে গ্রহণ করতে যাওয়া যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ বানচাল করে দেয়া। এসময়

প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি এক ভাষণে পাকিস্তানকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন।[২৩] অবশ্য ১৬ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী ঢাকা দখল করে নিলে এবং ঐদিনই পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব সোভিয়েত বিরোধিতা ছাড়াই গৃহীত হয়।

এভাবে যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করলেও রাশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তবে রুশ নীতির সতর্কতা সত্ত্বেও তারা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস কখনোই বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা পালন করেনি। এছাড়া পশ্চিমা গণমাধ্যমে দাবি করা হয় যে, মৈত্রী চুক্তির পর ভারত বিপুল পরিমাণ রুশ অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি লাভ করে।[২৪] শেষ পর্যায়ে এসে রুশ নীতির উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচিত বাঙালি প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্ত র এবং এই সরকারের রুশপন্থী অবস্থান গ্রহণ নিশ্চিত করা। যে কারণে যুদ্ধে ভারতের বিজয় নিশ্চিত হওয়ার মুহূর্তে অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর প্রথম রুশ উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুজনেৎসভ (Kuznetsov) দিল্লি উপস্থিত হন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রকৃতি যেনো মস্কোপন্থী হয় তার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করেন।[২৫]

২. বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ রাশিয়ার ভূমিকা (১৯৭১-৭৫)

রুশনীতিতে জাতীয় স্বার্থ অত্যন্ত বেশি ক্রিয়াশীল থাকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রাশিয়া পাকিস্তানের প্রতি নীতি নির্ধারণে সতর্কতা অবলম্বন করে। বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তারকারী পাকিস্তানকেও রাশিয়া কখনো বন্ধু হিসেবে হারাতে চায়নি। ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও মূলত আফ্রিকা-ইথিওপিয়া-সোমালিয়া উপকুল থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রে নৌ বন্দর ও নৌ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার আগ্রহ এবং এ এলাকার কেন্দ্রস্থলে পাকিস্তানের অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হওয়া রাশিয়ার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এছাড়া ১৯৬৯-৭০ থেকে মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তানের সামরিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণসহ সামগ্রিক প্রভাবও ও উপেক্ষনীয় ছিলনা। তাই ভূ-রাজণেতিক কারণে পাকিস্তানকে রাশিয়ার প্রয়োজন ছিল।

অন্যদিকে রুশ উদ্যোগে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় স্বাক্ষরিত তাসখন্দ চুক্তির প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগকারী জেড. এ. ভুট্টো রাশিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখলেও মূলত কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থে রাশিয়াকে উপেক্ষা করতে পারেনি। এভাবে উভয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার কারণে স্বাধীনতার পরপর উভয় দেশই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে এগিয়ে আসে। ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর রুশ পররাষ্ট্র দফতর এক বিবৃতিতে পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে রুশ সরকার তার এই নীতি অব্যাহত রাখে। ভুট্টোও তাই আজীবন রুশ বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিদ্যমান

অমীমাংসিত ইস্যুর সমাধানে রুশ সহযোগিতা কামনা করেছেন। এক্ষেত্রে রুশ নেতারা তাঁকে নিরাশ করেননি।

১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান অমীমাংসিত ইস্যুর ক্ষেত্রে রাশিয়া নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং সবসময় দেশ তিনটির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকায়নের জন্য তাগিদ দিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের মতো বিভক্ত পাকিস্তানও রাশিয়ার জন্যে কোনো সমস্যা নয়– এই বিবেচনা থেকে রাশিয়া পাক-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেপথ্য নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পাকিস্তানের বিবেচনায় রাশিয়ার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখার অন্য একটি কারণও ছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধীনতার দাবি, বিশেষত রুশ সমর্থিত পাঠানদের 'পাখতুনিস্তান' প্রতিষ্ঠার দাবি ভুট্টোকে রাশিয়ার প্রতি নতুন নীতি গ্রহণে অনুপ্রানিত করে। ভুট্টোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী খান আবদুল ওয়ালি খান এবং ন্যাপের পক্ষে যাতে রুশ সমর্থন না চলে যায় সেটিও বিবেচ্য ছিল। যে কারণে ভুট্টো ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যন্ত তিন বার মস্কো সফরে যান। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলোর সঙ্গে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও পাকিস্তান ঘোষণা করে যে, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে না।[২৭] ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর পরই মার্চ মাসে ভুট্টোর মস্কো সফর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এর চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মস্কো সফরের ১০ দিনের মাথায় ভুট্টোর মস্কো উপস্থিতি। ভুট্টোর এই সফরের দুদিন আগে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ভোজসভায় প্রদত্ত কোসিগিনের ভাষণে উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রুশ সমর্থনের অঙ্গীকার থেকে মনে হয় রাশিয়া অমীমাংসিত ইস্যুতে নীরব মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ভুট্টোর এই সফর তাই জরুরি ছিল। রুশ-পাক সম্পর্কের পটভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে রাশিয়ার ভারসাম্য রক্ষা ও রাশিয়ার অর্থানুকুল্যে পরিচালিত পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকল্পে সহযোগিতার আশ্বাস এবং উপমহাদেশের সমস্যার সমাধানে সোভিয়েত সহযোগিতা এই তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন। তবে সিমলা বৈঠককে সামনে রেখে শেষোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করাই ছিল ভুট্টোর মস্কোর সফরের মুখ্য বিবেচনা। এ কারণে তিনি চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্ব সফরের পর মস্কো সফর করেন। এই সফরকালে যুদ্ধবন্দি ও পাক ভূ-খণ্ড পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট দেশের সহযোগিতা কামনা থেকে এ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে ওঠে। মস্কো থেকে দেশে ফিরে ভুট্টো সাংবাদিকদের জানান, অধিকৃত ভূখণ্ড প্রত্যাবর্তণ ও যুদ্ধবন্দি মুক্তির ব্যাপারে তিনি রুশ সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছেন।[২৮] তবে ভুট্টোর সফরের ৯ দিন আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মস্কো সফরকালে রুশ নেতৃবৃন্দ আটক বাঙালিদের মুক্তির ব্যাপারে শেখ মুজিবকে আশ্বাস দিয়েছেন[২৯] সে প্রসঙ্গে তিনি কোনো মন্তব্য

করেননি। ভুট্টোর সফর শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে অবশ্য এ কথাটির উল্লেখ ছিল। এতে অমীমাংসিত ইস্যুর উল্লেখ না করে উপমহাদেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় রুশ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তাই এই সফরের সময় মস্কোর দেয়া লাল গালিচা সংবর্ধনা এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার অঙ্গীকার ভুট্টোর জন্য বড় পাওনা ছিল। মস্কো সফর শেষে দেশে ফিরে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সফর সম্পর্কে জানিয়ে ভুট্টো যে পত্র দেন তার থেকে সফরের ফলাফল জানা যায়। তিনি বলেন ঃ

I also gathered from the talks with Soviet leaders that the prisoners of war would not be returned until 'Bangladesh' had been recognised. I told them quite candidly that 'Bangladesh' had come into existance as a result of direct intervention by Indian armed forces and it would be unrealistic to expect the people of Pakistan readily to accept the dismemberment of their country in this fashion.[৩০]

প্রকৃতপক্ষে সিমলা বৈঠকের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগত কারণে কোনো প্রতিশ্রুতিতে যেতে চায়নি। রাশিয়া প্রকৃতপক্ষে অসীমাংসিত ইস্যুতে সরাসরি জড়িত না হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগকে প্রাধান্য দেয়। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ব্রেজনেভের বক্তব্য থেকে তা পরিস্কার হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতি রাশিয়ার সব ধরনের সমর্থন থাকবে। তবে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গেও সুসম্পর্ক কামনা করি।[৩১] অবশ্য ভুট্টোর মস্কো সফরের পর পাক ভারত বৈঠকের ব্যাপারে ভুট্টোর আগ্রহকে কোনো কোনো বিশ্লেষক এর পিছনে রুশ প্রভাবের ফল বলে মন্তব্য করেন।[৩২]

বাহাত্তরের জুলাই মাসে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরই রুশ পত্রপত্রিকা ও সরকারি মহল চুক্তিকে স্বাগত জানায়। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি এই চুক্তি পাক-ভারত সম্পর্কের স্বাভাবিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেন।[৩৩] 'প্রাভদা' সিমলা চুক্তিকে সমর্থন করে ১৪ আগস্ট প্রকাশ করে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন। তবে এ সময় ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে সিমলা বৈঠক কালে ঢাকাস্থ রুশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ যাতে ছাড় দেয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুদ্ধ বন্দীদের বিচারে দৃঢ় মনোভাবের কারণে তা সফল হয়নি এবং বাংলাদেশের অনুপস্থিতিতে সিমলায় এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনাও হয়নি। কোলকাতার 'আনন্দ বাজার' পত্রিকা এই সূত্র ধরে ২ জুলাই মন্তব্য করে বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি দিলে সে বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেবে বলে মস্কোকে আশ্বাস দিয়েছে। রুশ প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিলেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এ ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাবের কারণে প্রথম রুশ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। রুশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে এ যাত্রা দ্বিতীয় উদ্যোগও ব্যর্থ হয়।

তবে আগস্ট মাসে পাকিস্তানের যোগসাজসে চীনের ভেটোর কারণে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি নাকচ হয়ে গেলে রাশিয়া ক্ষুব্ধ হয়। এর দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, সদস্যভূক্তির উদ্যোগ গ্রহণকারীদের মধ্যে রাশিয়া ছিল অন্যতম। দ্বিতীয়ত, চীনের সঙ্গে শত্রুতার কারণে স্বাভাবিকভাবে চীনের এ উদ্যোগে রাশিয়া আহত হয়। রাশিয়া একে তার বিরুদ্ধে চৈনিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বিচেনা করে এবং মন্তব্য করে চীনের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তানের সন্তুষ্টি অর্জন।[৩৪] চীনের ভেটো উপমহাদেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে রাশিয়ার নেপথ্য ভূমিকায় ভাটা পড়ে। যদিও ২ সেপ্টেম্বর প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে উপমহাদেশের পরিস্থিতির অগ্রগতি সম্পর্কে রাশিয়ার পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগের তথ্য পরিবেশন করে। সূত্রটি আরো উল্লেখ করে রাশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এবং ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য পাকিস্তানকে উপদেশ দিয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে রাশিয়ার এই সম্পর্কের জন্য বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ন্যাপের কোয়ালিশন সরকারের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের ব্যাপারে ন্যাপ সহানুভূতিশীল ছিল এবং প্রথম থেকেই স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের ওপর দলটি গুরুত্বারোপ করে। বাহাত্তরের ২৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান-রাশিয়া মৈত্রী সমিতির ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতাকালে বেলুচিস্তানের গভর্নর মির গাউস বক্স বেজেঞ্জো বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সোভিয়েত হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[৩৫]

অবশ্য বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ব্যাপক চোরাচালানের ফলে ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মওলানা ভাষানী ও পিকিংপন্থি দলগুলো এই দুর্ভোগের জন্য রুশ-ভারত সরকারকে দায়ী করেন। এ সময় বিরোধীদল অভিযোগ করে যে, আওয়ামী লীগ সরকার রাশিয়াকে চট্টগ্রামে নৌঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদ তা অস্বীকার করেন।[৩৬] কিন্তু অপ্রতুল সোভিয়েত সাহায্য, দক্ষিণপন্থিদের উত্থান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ দাতা দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ, পিকিংপন্থীদের উত্থান প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে রুশ-ভারতের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। অথচ রাশিয়ার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকার জন্য পাকিস্তানে রুশ ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল হয়। ১৯৭৩ সালের সূচনায় যুদ্ধবন্দি ইস্যুতে পাকিস্তান বহির্বিশ্বে জনমত সংগঠনের অংশ হিসেবে ৪-৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হাফিজ পীরজাদা ভুট্টোর বিশেষ দূত হিসেবে মস্কো সফর করেন। সরকারি ঘোষণায় এ সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবন্দি মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ ও ভারতের ওপর রাশিয়ার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টিই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।[৩৭] যদিও এ মাসের

১০ তারিখে ইসলামাবাদে ইরাকি দূতাবাসে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার এবং এ ঘটনার জন্য পাকিস্তানের ইরাক ও রাশিয়ার মাধ্যমে বেলুচিস্তানে অস্ত্র প্রেরণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে[৩৮] রুশ-পাক সম্পর্কের সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার জন্য ইরাক ও পাকিস্তান কূটনৈতিকদের বহিষ্কার ও পাল্টা বহিষ্কার করলেও পাকিস্তান বৃহত্তর স্বার্থে রুশ কূটনৈতিকদের বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়নি। বরং এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত রুশ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য প্রথমবারের মতো মস্কো যান।[৩৯]

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের যুক্ত ঘোষণা রুশ নেতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। তাস এই ঘোষণাকে উপমহাদেশের উত্তেজনা প্রশমন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় দুটি দেশের অবিরাম প্রচেষ্টার ফসল বলে মন্তব্য করে এবং পাকিস্তানকে এই প্রস্তাব গ্রহণের পরামর্শ দেয়।[৪০] সোভিয়েত দৈনিক ইজভেসতিয়া (Izvestia) অনুরূপ মন্তব্য করে। যুক্ত ঘোষণার পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ সময় সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ মস্কো সফর করেন এবং প্রতি রুশ নেতৃবৃন্দের সমর্থনের আশ্বাস পান। ২৫ মে প্রকাশিত রুশ-আফগান যুক্ত ইশতেহারেও উল্লিখিত যুক্ত ঘোষণাকে উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিকায়নের অনুকূলে একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হয়।[৪১] মূলত যুক্ত ঘোষণার প্রতি রুশ-মার্কিন সমর্থনের ফলে পাকিস্তান জুলাই মাসে পাক-ভারত বৈঠক এবং তারই ধারাবাহিকতায় আগস্টে বৈঠক ও চুক্তি স্বাক্ষর করে। পাক-ভারত এই চুক্তি রুশ পত্রিকায় ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে। ৩০ আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা' একে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তির রক্ষাকবচ বলে অবিহিত করে। এই চুক্তির আওতায় সেপ্টেম্বর মাসে লোক বিনিময় শুরু হলে রাশিয়া একটি বিমান ও নৌপথে লোক বিনিময়ের জন্য একটি জাহাজ দিয়ে সহযোগিতা করে। বিমানটি অক্টোবর এবং জাহাজটি নভেম্বর মাস থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[৪২] ১৪ নভেম্বর ৯১৫ জন বিহারিকে নিয়ে প্রথম রুশ জাহাজটি করাচি পৌঁছে। এ ছাড়া অক্টোবর মাসে আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তান সফর করেন। এদিকে সোভিয়েত অর্থানুকুল্যে নির্মিত করাচি স্টিল মিলের কাজ এ বছর এগিয়ে যায় এবং কয়েকটি বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিনিধিদল উভয় দেশ সফরের ফলে ফেব্রুয়ারি মাসে ইরাকি দূতাবাসে অস্ত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি তার অবসান ঘটে। ভুট্টো সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্কের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।[৪৩]

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নেও স্বস্তির হাওয়া বয়ে যায়। তাস ঐ দিনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে এবং পারস্পরিক শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।[৪৪] সোভিয়েত বার্তা সংস্থা এপিএন একে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নতুন

অধ্যায়ের সূচনা বলে মন্তব্য করে।[৪৫] এ সময় আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারতের প্রতি মস্কোর সমর্থন সত্ত্বেও পাক-রুশ সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি।

প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে মস্কোর আগ্রহই পাকিস্তানকে মস্কোর প্রতি উদারনীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। যদিও ২৫ জুন মস্কো ও ইসলামাবাদ থেকে এক যুক্ত ঘোষণায় ভুট্টোর আসন্ন ৮ জুলাই মস্কোর সফর বাতিল করা হয়। অথচ জুনের ২০ তারিখে অতর্কিত এক ঘোষনায় তিনি জুনের ২৮ তারিখে বাংলাদেশ সফরের ঘোষণা দেন। মূলত অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখিয়ে তাঁর মস্কো সফর বাতিল করা হলেও এর পিছনে ১৮ মে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণে রুশ নীরবতা ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বৈঠক বাতিলের প্রতিক্রিয়ার মুখ্য কারণ হিসেবে কাজ করেছে বলে অনেক বিশ্লেষক মন্তব্য করেন। ভুট্টো এ সময় ভারতের একনিষ্ঠ মিত্র রাশিয়ার চেয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে এক মঞ্চে সমবেত করার চেষ্টা চালান। বাংলাদেশের ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ সফরকে তিনি প্রাধান্য দেন। এসময় পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কে স্থবিরতা নেমে আসে। রাশিয়ার বাংলাদেশ নীতিতে ভারতকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সকল সময় ক্রিয়াশীল ছিল। মুজিব আমলে রাশিয়া ও ভারত বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক পরিবর্তনকে সমর্থন দেয়। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে রুশ মডেলের মিল না থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। ফেব্রুয়ারি মাসে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাকশাল প্রবর্তনের পরও রুশ সহযোগিতা ও সমর্থন অব্যাহত থাকে।[৪৬] অথচ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বিরোধীরা বাকশাল প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করে এবং এ পর্যায়ে বাংলাদেশে রুশ বিরোধী জনমত ক্রমশ শক্তি অর্জন করে।

৩. বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ঃ রাশিয়ার ভূমিকা (১৯৭৫-৮১)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড ও খন্দকার মোশতাক আহমদের ক্ষমতা গ্রহণ বাংলাদেশের ব্যাপারে রুশ আগ্রহে ভাটা পড়ে। মোশতাক ও জিয়ার আমলে রুশ-ভারত বিরোধী মনোভাবের কারণে বাংলাদেশ-সোভিয়েত সম্পর্ক পাকিস্তান-রাশিয়ার সংগে সম্পর্কের মতো দশাপ্রাপ্ত হয়। জিয়ার আমলে ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা ইস্যুতে চীন ভারতের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও রাশিয়অ নিরপেক্ষতার বদলে সরাসরি ভারতে পক্ষ নেয়।[৪৭] জিয়ার আমলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাদে প্রায় সকল দলের নির্বাচনী কর্মসূচিতে বাংলাদেশকে 'রুশ-ভারত আগ্রাসন' থেকে মুক্তির অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। অন্যদিকে ১৯৭৭ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে ভুট্টোর রুশ নির্ভরশীলতা বরং

বেড়ে যায়। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাই চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভুট্টো-বিরোধী প্রচারণা চালালেও রুশ পত্রিকাগুলো ভুট্টোকেই সমর্থন দেয়। ১৯৭৭ সালে এসে ভুট্টো তাই রাশিয়ার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হন। নির্বাচনে ভুট্টোর বিজয়কে মার্কিন কোনো কোনো পত্রিকায় ব্যাপক দুর্নীতির ফল বলে আখ্যা দিলেও 'প্রাভদা' পিপিপির বিজয়কে ভুট্টোর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সাফল্য বলে মন্তব্য করে।[৪৮] যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়াও পারমাণবিক শক্তি অর্জনে পাকিস্তানের উদ্যোগের বিরোধিতা করে।

তবে ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপ পাক-মার্কিন মনোমালিন্যের অবসান ঘটায় এবং এ দুটো দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। বাংলাদেশ সরাসরি প্রভাবিত কোন দেশ না হয়েও রুশ বিরোধী মনোভাবের কারণে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ অতি উৎসাহী হয়ে রাশিয়ার নিন্দা জানায় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে।[৪৯] এ ছাড়া বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থাসহ জাতিসংঘে অনতিবিলম্বে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়।[৫০] এইভাবে আফগান ইস্যুতে রুশ-পাক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটায় এবং ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ইসলামাবাদে রুশ দূতাবাসের কর্মচারী হ্রাস করার নির্দেশ দেন।[৫১] উল্লেখ্য, মোশতাক ও জিয়াউর রহমানের শাসনামলে একইভাবে বাংলাদেশেও রুশ দূতাবাসের কার্যক্রম লিখিত-অলিখিত নির্দেশনামা বলে হ্রাস করার প্রয়াস কার্যকর করা হয়। অবশ্য ভারত তখনো রুশ নীতি সম্পর্কে প্রকাশ্য কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ২০ জানুয়ারি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সরকারের রুশ প্রীতি বিষয়ে দেশটির বিরোধীদলের অভিযোগের ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমরা রাশিয়াপন্থী, মার্কিনপন্থী কোনোটাই নই, আমরা ভারতপন্থী।[৫২] এ সময় জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন, ৭৭ জাতি গ্রুপসহ অধিকাংশ ফোরামে রুশনীতি সমালোচিত হলেও ভারত সরাসরি রাশিয়ার পক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার নীতি পরিত্যাগ করে মধ্যপন্থী নীতি অনুসরণ করে। তবে বাংলাদেশের উৎসাহী মনোভাব একটি পরাশক্তির বৈরিতা ডেকে আনারই শামিল ছিল। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সবগুলো দেশ যেখানে এ বিষয় একমত হতে পারেনি সেখানে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অনুরূপ নীতিই অনুসরণ করতে পারতো। অবশ্য বাংলাদেশের'৭৫ পরবর্তীকালের সরকারগুলোর রুশ-বিরোধী নীতির কারণে হয়তো এটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ এর ফলে জিয়ার আমলে মার্কিন ও চৈনিক সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে রুশ ভূমিকা খুবই সতর্কতামূলক। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর উপমহাদেশের শান্তি এবং নিজস্ব জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় রাশিয়া বাংলাদেশ ও

পাকিস্তানের মধ্যে অমীমাংসিত ইস্যুতে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে। কখনো কখনো মধ্যস্থতা করতেও চেষ্টা চালায়। যদিও এ ব্যাপারে পাকিস্তানের কট্টর মার্কিন ও চীন ঘেঁষা নীতির কারণে রুশ নীতি বিশেষ সফল হয়নি। তবে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ঘোষণা, আগস্ট মাসে দিল্লি চুক্তি, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের পেছনে রুশ প্রভাব ছিল প্রবল। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমদ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ও ১৯৫ জন পাক যুদ্ধবন্দি মুক্তির ব্যাপারে রুশ প্রভাবের কথা স্বীকার করেন।[৫৩] বরং রুশ অনাগ্রহের কারণেই বাংলাদেশ ও ভারত পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের আটক রেখে পাকিস্তানের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ে সক্ষম হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি ও সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রভাব বলয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাশিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের মতোই তৎপর ছিল। যদিও সীমিত আর্থিক সহায়তা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে রুশ প্রভাব স্থায়ী হয়নি। মুজিব সরকার বাংলাদেশ রুশ বিরোধী তৎপরতা ও চাহিদা মাফিক আর্থিক সহায়তা না পেয়ে বরং মার্কিন আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে দুটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা চালায়। অন্যদিকে ১৯৭৪ সালের পর পাকিস্তানের স্বীকৃতি, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভুট্টো সরকারের রাশিয়ার মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা কমে আসতে থাকে। ১৯৭৫ সালে মুজিবের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে দুটি দেশের ব্যাপারে রুশ ভূমিকা তেমন লক্ষনীয় ছিল না। বরং মুজিবের উত্তরসূরিদের সরাসরি রুশ বিরোধী নীতি, আফগান ইস্যুতে পাকিস্তানের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের চরম অবনতি এবং এতে বাংলাদেশের পাকিস্তানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন রুশ সরকারকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। বরং এসময় অভ্যন্তরীন ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যেখানে রুশ নীতি জড়িত ছিল সেখানে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে এক যোগে রাশিয়ার বিরোধিতা করে। ১৯৭৫-৮১ সাল পর্যন্ত এই নীতিতে উভয় দেশ অটুট থাকে।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. *Kessing's Contemporary Archives*, Vol. XVIII, 1971-1972, p. 24600.

২. *Pravda*, 4 April 1971; দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ ১৩ খণ্ড*, (ঢাকা ঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২), পৃঃ ৫৬১। এই মূলপত্রের জন্য দ্রষ্টব্য Robert Jackson, *South Asian Crisis* (London : Chatto and Windus, 1975,). p. 172

৩. Golam Mostafa, *National Interest and Foreign Policy: Bangladesh's Relations with Soviet Union* (New Delhi : South Asian Publishers, 1995) p. 78

৪. মঈদুল হাসান, মুলধারা ৭১ (ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৮৬), পৃ. ৩৬

৫. *Pravda*, 9 June 1971.

৬. *Ibid*, 10 June 1971.

৭. *Bangladesh Documents,* Vol. II (Dhaka : UPL, 1999) pp. 156-157 বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য Pan Chopra, *Before After the Indo-Soviet Treaty* (New Delhi : S. Chand and Co. 1972, pp. 162-66.

৮. Henrey Kissinger, *The White House Year* (Boston : Little, Brown and Company, 1979), P. 866

৯. দ্রষ্টব্য Robert Jackson, *op. cit.* p. 70.

১০. *Indian Express*, 20 August 1971.

১১. *Hindu*, 11 September 1971.

১২. *Pakistan Times,* 16 August 1971; আরো দ্রষ্টব্য, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী), ১৯৮২, পৃ. ৪২।

১৩. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬৮।

১৪. *Times of India,* 10 October 1971.

১৫. দ্রষ্টব্য *Indian Express*, 10 October 1971.

১৬. *Kessing's, op. cit.,* p. 24992

১৭. মঈদুল হাসান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮.

১৮. *Times* (London), 28 October 1971.

১৯. *Statesman*, 29 October 1971.

২০. Henrey Kissinger, *op. cit.,* p. 877

২১. *Moscow News,* No. 51, 18 December 1971, p. 3 in S.R. Sharma, Bangladesh *Crisis and Indian Foreign Policy* (New Delhi : Young Asia Publications, 1978), p. 301.

২২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৩। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ২৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারত, পাকিস্তান ও রাশিয়াকে তারবার্তা পাঠান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Kissing's, *op. cit.,* p. 24996

২৩. সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা। হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৭৯।

২৪. পশ্চিমা গণমাধ্যম দাবি করে যে, নভেম্বরের মধ্যে ভারতকে রাশিয়া ১৫টি রুশ বিমান ভর্তি ৫০০০ টন যুদ্ধ সরঞ্জাম, ২৫০টি ট্যাংক, ৪০টি ১২০ এম.এম. রকেট, মিগ-২৩ যুদ্ধ জাহাজ এবং ৫টি এসইউ-৭ এস জাহাজ সরবরাহ করে। আরো সরবরাহ করে ভারতীয় বিমানের জন্যে খুচরো যন্ত্রাংশ। দ্রষ্টব্য Nisha Sahia Achuthan, *Soviet Arms Transfer Policy in South Asia* (1955-1981) (New Delhi : Lancer International, 1988), p. 58; আরো দ্রষ্টব্য এ.এস.এম. শামসুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান* (ঢাকা ঃ ইউপিএল, ১৯৯৫) পৃ. ৪৫৩।

২৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৫।

২৬. *সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত* পুস্তিকা, দ্রষ্টব্য হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত* পৃ. ৫৮০।

২৭. *Facts On File,* Vol. XXXII, No, 1630, 23-27 January, 1972, p. 50.

২৮. Devendra Kaushik, *Soviet Relations with India and Pakistan* (Delhi : Viksa 1974), p. 141.

২৯. *দৈনিক বাংলা,* ৫ মার্চ, ১৯৭২।

৩০. Roedad Kahn, *The American Papers: Secret and Confidential India-Pakistan-Bangladesh Documents 1965-1973* (Dhaka : UPL, 1992), p. 842.

৩১. *Pakistan Horizon,* Chronology, Vol. XXV, No. 2, 1972, p. 84.

৩২. Devendra Kaushik, *op. cit.* Vol. XXV p. 86.

৩৩. *Pakistan Horizon, op. cit,* Vol XXV, p. 86.

৩৪. *Ibid, op. cit.* No. 3 pp. 98-99.

৩৫. *গণকণ্ঠ,* ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭২।

৩৬. *দৈনিক স্বদেশ,* ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৩।

৩৭. *Pakistan Times,* 6 February 1973.

৩৮. *Pakistak Horizon, op. cit,* p. 70.

৩৯. *Morning News* (Karachi), 30 April, 1973.

৪০. *পূর্বদেশ*, ২১ এপ্রিল ১৯৭৩।

৪১. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬ মে ১৯৭৩।

৪২. *Dawn*, 9 october 1973, আরো দ্রষ্টব্য *Palistan Horizon*, Chronology, Vol. XXVII, No. 4 1973, p. 74, ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রাশিয়া লোক বিনিময় সহযোগিতা করে।

৪৩. Dilara Choudhury, *Bangladesh and the South Asian International System* (Dhaka : Academic Publishers, 1988), pp. 42-43.

৪৪. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪।

৪৫. *Morning News* (karachi), 28 February, 1974.

৪৬. *পূর্বদেশ*, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৫, দৈনিক ইত্তেফাক ও ২০ জানুয়ারি ১৯৭৫। বাকশাল সম্পর্কে রুশ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দ্রষ্টব্য তারেক শামসুর রেহমান, *সোভিয়েত-বাংলাদেশ সম্পর্ক* (ঢাকা ঃ একাডেমিক পাবলিশার্স ১৯৯৩) পৃ. ৪৮-৫৩।

৪৭. *দৈনিক আজাদ*, ১৫ মে, ১৯৭৮।

৪৮. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২৩ মার্চ ১৯৮০, পৃ. ১৮।

৪৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ*, (ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫) পৃ. ৪৭-৪৮।

৫০. *Bangladesh Times*, 30 December 1979.

৫১. *Pakistan Horizon*, Vol. XXXII, No. 3, 1980, p. 116. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Della Denmen, "Zias Cracks Down on the Kermlin", *Far Eastern Deconomic Review*, 29 August 1980, p. 19.

৫২. *সংবাদ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৮০।

৫৩. ফখরুদ্দীন আহমদ, *উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলি ঃ এক এশীয় কুটনীতিকের স্মৃতিকথা* (ঢাকা ঃ দিব্য প্রকাশন, ২০০১) পৃ. ১০৬।